PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-15, No.-1, May 2024

মনুসংহিতার আলোকে প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি

জয়নাল মণ্ডল

সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, বি সি কলেজ ,পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩৩০৪
ইমেইল: *joynalmandal.0321@gmail.com*

সারসংক্ষেপ

মনুসংহিতা ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্র। স্মৃতিশাস্ত্র বলতে বেদের অর্থ স্মরণপূর্বক রচিত গ্রন্থকে বোঝায়। আচার্য মনু রচিত মনুসংহিতা বা মনুস্মৃতির রচনাকাল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতক।আজ দেশে রাজা নেই, আছে রাজ্য এবং রাজ্যশাসন ব্যাবস্থা, আছেন মন্ত্রিগণ এবং সচিবগণ। করব্যবস্থা, যুদ্ধনীতি ব্যসনাসক্তি, মন্ত্রগুপ্তি, দূতপ্রেরণ, চরনিয়োগ সবই রয়েছে নতূনরূপে ও নতূন সাজে। এই বিষয়গুলি নিয়ে সেকালের চিন্তাভাবনা কেমন ছিল তা জানায় বলে এই গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম। মনুসংহিতায় বর্ণাশ্রমধর্মের নানা বিষয় বর্ণিত হলেও রাজতন্ত্রকে উপেক্ষা করা হয়নি। আচার্য মনু সপ্তাঙ্গ প্রকৃতি বিষয়ে বিশেষ অবহিত ছিলেন। স্বামী, অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোষ, জনপদ ও মিত্র, এই অঙ্গ সাতটির মধ্যে স্বামী হলেন রাজা। রাজা এবং তার ত্রিবিধ শক্তি। যথা-প্রভুশক্তি, মন্ত্রশক্তি ও উৎসাহশক্তি অবলম্বনেই গড়ে ওঠে রাজতন্ত্র। কিন্তু এই রাজতন্ত্রে রাজার উদ্ভব ঘটল কিভাবে? তাই মনুসংহিতায় বলা হয়েছে -লোকরক্ষার জন্য ঈশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করেছেন। রাজতন্ত্রে রাজাই একমাত্র ও প্রধান শাসক হলেও রাষ্ট্রপরিচালনার মত সুমহৎ কর্ম রাজার পক্ষে একাই পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই রাজ্যপরিচালনার জন্য রাজাকে অমাত্য বা সচিব নিয়োগ করতে হবে। শত্রুরাজার সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য জানার জন্য চর বা গুপ্তচর নিয়োগ করা রাজার একান্ত কর্তব্য। তৎকালীন যুগে রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য রাজধানী নির্মাণ, রাজভবন নির্মাণ করার কথাও উল্লেখিত হয়েছে। রাজার রাজ্য রক্ষা ও যুদ্ধ জয়ের জন্য দুর্গ নির্মাণ ও তার প্রকারভেদ এবং গুণগত উৎকৃষ্টতার বর্ণনা দেখা যায়। রাজবৃদ্ধির উপায় বলতে গিয়ে আচার্য মনু করগ্রহণ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তৎকালীন সময়ের রাজাদের যুদ্ধনীতি বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনাও এই গ্রন্থ হতে পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হল অস্ত্রধারণ ও দেশ রক্ষা। তাই ক্ষত্রিয় রাজার পক্ষে যুদ্ধ করা একটি পবিত্র কাজ। মনুসংহিতায় উল্লেখিত সেই সময় যুদ্ধক্ষেত্রে চার প্রকার অস্ত্র নিষিদ্ধ ছিল আবার যুদ্ধক্ষেত্রে কিছু নিয়ম চালু ছিল। যেমন- রথারূঢ় যোদ্ধা ভূতলস্থ যোদ্ধাকে বধ করবে না ইত্যাদি।

সূচকশব্দঃ রাষ্ট্র, রাজা, সচিব, দন্ড, দুর্গ, কর, যুদ্ধ।

ভূমিকা

আচার্য মনু রচিত মনুসংহিতা বা মনুস্মৃতি দ্বাদশ অধ্যায় বিশিষ্ট গ্রন্থ। ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসে মনুসংহিতার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনু একাধারে ছিলেন রাজনীতিবিদ এবং সমাজনীতিবিদ। তবে রাজনীতিবিদ হিসাবে নয় সমাজনীতিবিদ হিসাবে তিনি জগৎবিখ্যাত। প্রাচীন ভারতীয় সমাজের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার ও রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার একটি সুস্পষ্ট চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর এই মহাগ্রন্থে। আবার আধুনিক ভারতের সামাজিক রীতিনীতি ও বিচারব্যবস্থাও অনুসৃত হয়েছে এই মহাগ্রন্থের বিধানগুলি থেকেই। প্রাচীন ভারতীয় সমাজের যে প্রতিচ্ছবি বৈদিক সাহিত্যে পরিস্ফুট হয়েছে তা কোন ভীততন্ত্র

মানবগোষ্ঠীর দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের চিত্র নয়, তা কোন বর্বর সংস্কৃতিহীন জাতির অতিনগণ্য জীবনচর্চা নয়। সহজ সরল জীবন যাত্রার মধ্যেই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের প্রতি আকুলতা, পার্থিব জীবনের তুচ্ছতার উর্দ্ধে উঠে অপার্থিব আলোকের উৎসারে অবগাহনই ভারতীয় সমাজ জীবনের বৈশিষ্ট্য।

বিষয়বস্তু

সমাজ যদি রাজশূন্য হয় তাহলে চারদিক থেকেই সকলেই বলবানের দ্বারা উৎপীড়িত ও অস্থির হয়ে পড়ে। ভয়ে লোক বিভিন্ন দিক থেকে পলায়ন করে। এই কারনে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করেছেন। আর রাজার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বপ্রণীর রক্ষক, ধর্মস্বরূপ, ব্রহ্মতেজ থেকে ঈশ্বর দন্ডকে পূর্বে সৃষ্টি করেছেন। রাজ্য পালনের মূল সহায়ক হল দন্ড। দন্ড ছাড়া রাষ্ট্রে শাসনের কোন অস্তিত্বই থাকে না। রাজা দন্ড ধারন করেন একথা বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দন্ডই শাসনকর্তা। রাজার রক্ষিপুরুষগণ নিদ্রিত হলেও দন্ডই জাগ্রত থাকে এবং অপরাধীর অপরাধ সর্বদা তার দৃষ্টিগোচর হয়। দন্ডের ভয়েই চোরগণ নিজ পাপকর্মে প্রবৃত্ত হতে পারে না। তাই মনু বলেছেন- ‘দন্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্তি দন্ডং ধর্মং বিদুর্বুধাঃ’। দন্ডের ভয়ে স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল বিশ্বের সকল প্রাণী ভোগে সমর্থ হয় এবং কেউ স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় না। প্রজাপালননামক ধর্মের সুষ্ঠু পালনের জন্য অপরাধীর উপর যথাশাস্ত্র দন্ড প্রয়োগ অপরিহার্য। কেননা প্রজার সুখেই রাজার সুখ-‘প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ প্রজানাঞ্চ হিতে হিতম্’।এই দন্ডের অপ্রয়োগে যেমন ক্ষতি তেমনি দন্ডের অপপ্রয়োগেও সমান ক্ষতি। জলে যেমন-বৃহৎ মৎস্য নির্বিচারে ক্ষুদ্র মৎস্যগুলিকে গ্রাস করে, তেমনি দন্ডাভাবে বলবান দুর্বলের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার নিপীড়ন করে। যথাশাস্ত্র দন্ড প্রযুক্ত না হলে সমাজে মাৎস্যন্যায় প্রবর্তিত হবে। তাই মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে-‘শূলে মৎস্যানিবাপক্ষ্যন্ দুর্বলান্ বলবত্তরাঃ’।তখন কোন বিষয়ে কারো সাম্য বা অধিকার থাকে না।দন্ডের অভাবে কাক,কুকুর প্রভৃতি হীন প্রণী দেবভোগ্য যজ্ঞীয় হবি ভোজন করবে, চারিদিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তাই রাজা অপরাধীর অপরাধ বিবেচনা করে যথাযোগ্য দন্ডবিধান করবেন। আবার মনু কর্তৃক প্রবর্তিত বিচারব্যবস্থাও অনেক উন্নত ছিল। পরবর্তী ধর্মশাস্ত্রকারগণ বিচারব্যবস্থা বিষয়ে মনুর নির্দেশ সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় আইন ব্যবস্থায়ও মনুর বিধান অতি সমাদরে গৃহীত হয়েছে। যেমন- সমান জাতীয় ব্যাক্তিদের মধ্যে কেউ যদি কারোর গায়ের চামড়া ফাটিয়ে দেয় কিংবা কেটে দেয় বা রক্তপাত ঘটায় তাহলে তার একশ পণ দন্ড। আবার অস্থিভেদ করলে তার নির্বাসন দন্ড হবে। শুদ্রব্যাক্তি হাত উঠিয়ে কিংবা লাঠি দিয়ে ক্রোধের সাথে উচ্চ জাতিকে প্রহার করে তবে তার শাস্তি স্বরূপ হাত কেটে দেবে। ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয়ের প্রতি গালিগালাজ করে তাহলে তার পঞ্চাশপণ দন্ড হবে। আবার ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণকে গালাগালি দেয় তাহলে তার একশ পণ দন্ড হবে। চোরের দন্ড হল তাকে বধ করা, তার সর্বস্ব

বাজেয়াপ্ত করা ইত্যাদি। মূলতঃ রাজা শাশ্বত ধর্মকে অনুসরণ করে সত্য ও ন্যায় নিরূপণ করতেন এবং রাজা যখন নিজে নিরূপণ করতে অসমর্থ হতেন, তখন তিনি বিচারের কাজ সম্পাদন করার জন্য বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করবেন। বন্ধ্যা, পতিব্রতা, পুত্রহীনা, রোগগ্রস্তা, নিষ্কুলা নারী এদের সম্পদ রাজা রক্ষা করবেন এবং তাদের আত্মীয়-স্বজন ছলপূর্বক তাদের ধন গ্রহণ করলে রাজা তাদের চোরের মত শাস্তি দিবেন। উত্তমর্ণ অর্থাৎ মহাজন ঋণগ্রহণকারীকে যে ঋণ দিবেন তা উদ্ধার করতে না পেরে যদি রাজার কাছে নালিশ করে তবে রাজা সাক্ষি-লেখ্যাদি প্রমাণের সাহায্যে সত্যতা নিরূপণ করে উত্তমর্ণের অর্থ ফিরিয়ে দিতে অধমর্ণ কে বাধ্য করবেন। অপরাধীর দোষ প্রমাণ করার জন্য সাক্ষীর সাহায্য নেওয়া হত। সকল বর্ণের মধ্যে যারা আপ্ত, শ্রুতি, স্মৃতি, আচার প্রভৃতি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, লোভশূন্য-এইরকম লোকই সকল ব্যবহারে সাক্ষী করা হয়। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অপরাধ বা পাপ, যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় সে বরুণপাশে বদ্ধ হয়ে শতজন্ম প্রর্যন্ত পীড়া অনুভব করে।

রাজকার্যের মত সুমহৎ কর্ম রাজার পক্ষে একাকী সম্পাদন করা খুবই কষ্টকর। সুতরাং সমৃদ্ধিশালী রাজ্য একাকী শাসন করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। কাজেই রাজাকে প্রশাসনের কার্যে সহায়তা করার জন্য সচিব(মন্ত্রি) নিয়োগ করা একান্ত অপরিহার্য। মন্ত্রিসভার পরামর্শে রাজা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। রাজা বংশপরম্পরাগত রাজসেবক, বেদাদিধর্মশাস্ত্রে পারদর্শী, বীর, যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ, বিশুদ্ধ কুলজাত এবং সুপরীক্ষিত- এই রকম সাত বা আটজন সচিব(মন্ত্রি) নিয়োগ করবেন। অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্যের মতে এই সংখ্যা তিন বা চার জন। রাজা ঐ মন্ত্রিদের সাথে সাধারণ সন্ধি ও বিগ্রহ বিষয়ে চিন্তা করবেন। মন্ত্রিদের সাথে রাজা দন্ড, কোষ(অর্থের আয়-ব্যয়) পুর এবং দেশবাসীর রক্ষার বিষয়ে চিন্তা করবেন, ধান-হিরণ্য প্রভূতির উৎপত্তিস্থান নিরূপণ করবেন, নিজেকে এবং রাষ্ট্রের প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এবং লব্ধ ধন যাতে সৎপাত্রে ন্যস্ত হয় সে বিষয়ে চিন্তা করবেন।

রাজশাসন পরিচালনার জন্য দূতের আবশ্যকতাও অপরিহার্য ছিল। যা আধুনিক কালেও প্রতিটি রাষ্ট্র তাদের রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করে থাকেন। রাজা দূতের মাধ্যমে দেখতেন-কারা তার মিত্র, আর কারাই বা শত্রু, আর রাজ্যের প্রকৃত অবস্থাই বা কেমন। যিনি সর্বশাস্ত্র বিশারদ, স্বরাজার প্রতি অনুরক্ত, শৌচযুক্ত, কর্ম-কুশল, যিনি আকার ও ঈঙ্গিত দ্বারা অন্যের মনোভাব বুঝতে পারেন, যিনি সদ্বংশজাত, ভয়হীন, বাগ্মী এমন লোককেই রাজা দূত নির্বাচন করবেন। রাজা সন্ধি ও বিগ্রহ প্রভূতি যে ষড়গুণ চিন্তা করেন, তাদের মধ্যে সন্ধি ও বিগ্রহ এই দুটি প্রধানতঃ দূতের অধীনে। দূত যদি অন্য রাজার কাছে মিষ্টি কথা বলতে পারে, প্রভুর কাজ যদি ঠিকমত বিবেচনা করে দেখিয়ে দেয়, তাহলে দুই রাজার মধ্যে সন্ধি হতে পারে। আর তা না হলে যুদ্ধ। আচার্য কৌটিল্যও বলেন যে, দূত অমাত্যগুণযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। উল্লেখযোগ্য যে, মনুসংহিতায় দূতের মধ্যে কোন শ্রেণীভেদ স্বীকার করা হয়নি। কিন্তু

অর্থশাস্ত্রে দূতকে তিন শ্রেণীতে বিন্যাস করা হয়েছে। যথা -নিঃসৃষ্টার্থ দূত, পরিমিতার্থ ও শাসনহর দূত।

মনুসংহিতায় রাজা কর্তৃক চর বা গুপ্তচরের নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। আচার্য মনু পঞ্চবর্গ বা পাঁচ রকম গুপ্তচরের উল্লেখ করেছেন। যথা- কাপটিক, উদাস্থিত, গৃহপতিব্যঞ্জন ও তাপসব্যঞ্জন। রাজার যে সমস্ত গুপ্তচর নিযুক্ত আছে তাদের ক্রিয়াকলাপ কেমন- রাজাকে এই সমস্ত বিষয়ের সঠিক সংবাদ রাখতে হবে। রামায়ণে বলা হয়েছে যে যেহতু রাজারা দূরে অবস্থান করেও চরের চোখ দিয়ে স্বরাজ্য ও পররাজ্যের সব কিছু দেখে থাকেন সেহেতু রাজারা হলেন চারচক্ষু। রাজ্যের পক্ষে কে শত্রু কে বা মিত্র এ পরিচয় করা কষ্টসাধ্য। চরের সাহায্যেই রাজা শত্রু ও মিত্রের কার্যকলাপ সমন্ধে অবহিত হবেন। এমনকি মন্ত্রি, পুরোহিত প্রভৃতির অনুরাগ ও বিরাগ গুপ্তচরের মাধ্যমেই রাজা জানবেন। কৌটিল্যের কালেও এই গুপ্তচর প্রথা অত্যন্ত উন্নত ছিল এবং কোন কোন গুপ্তচর উভয়দিকে বেতন গ্রহণ করত, তারা স্বপ্রভু ও শত্রুরাজা উভয়ের কাজ করত। সেক্ষেত্রে ঐ চর যাতে নিজ প্রভুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না করে তাই তার অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রীপুত্রাদিকে প্রভুর রাজ্যে রেখে যেতে হত।

আধুনিক যুগে রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ সাধারণতঃ রাজধানী থেকেই সুসম্পন্ন হয়। অনুরূপ প্রাচীন ভারতবর্ষেও রাজারা বাসস্থান(রাজধানী) নির্মাণ করে সেখান থেকে রাজকার্য পরিচালনা করতেন । রাজধানী নির্মাণের উপযুক্ত দেশ সম্পর্কে মনু বলেছেন - জাঙ্গলদেশ(যেখানে জল ও অল্প ঘাস এবং প্রচুর আলো বাতাস আছে), যে স্থান বহু শস্যযুক্ত, ধার্মিকলোকবহুল, রোগাদিমুক্ত, মনোরম, যেখানে প্রান্তবতী জনগণ বিশেষ বশীভূত এবং যেখানে জীবনযাত্রা সহজ ও সুন্দর -এমন দেশেই রাজা বাসস্থান নির্মাণ করবেন। এই রকম স্থানে অর্থাৎ রাজধানীর চারিপাশ দুর্গ দ্বারা বেষ্টিত হবে। মনু ছয় প্রকার দুর্গ নির্মাণের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল- ধন্বদুর্গ, মহীদুর্গ(পাষাণ বা ইট নির্মিত দুর্গ), নৃদুর্গ, বার্ক্ষদুর্গ এবং গিরিদুর্গ(পাহাড়ের উপরে অবস্থিত দুর্গম নিভৃত দুর্গ)। মনুর মতে এই ছয় প্রকার দুর্গের মধ্যে গিরি দুর্গই শ্রেষ্ঠ-'সর্বেণ হি প্রযত্নেন গিরিদুর্গং সমাশ্রয়েৎ'। কারণ এই গিরিদুর্গে শত্রুরা সহজে উঠতে পারে না এবং সহজেই পাহাড়ের উপর থেকে পাথর প্রভৃতি গড়িয়ে দিলে শত্রু নিপাত ঘটে, তাই বহুগুণ সম্পন্ন গিরিদুর্গই প্রশংসিত। সুতরাং রাজা যদি সুরক্ষিত দুর্গে বাস করে তাহলে প্রতিপক্ষ রাজা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। মনুর মতে প্রত্যেক রাজার উচিত দুর্গ তৈরী করে সৈন্যাদির সাথে সেখানে বসবাস করা। কেননা দুর্গ প্রকারের মধ্যস্থিত কেবলমাত্র একজন ধনুর্ধারী যোদ্ধা একাই বাইরের একশ শত্রুপক্ষীয় সৈন্যের সাথে যুদ্ধ করতে সমর্থ। রাজা যে দুর্গকে আশ্রয় করবেন, সেটি অস্ত্রশস্ত্র যুক্ত হবে এবং ধনসম্পদ, শস্য, হাতি-ঘোড়া প্রভৃতি বাহন, ব্রাহ্মণ, নানা শিল্পী, বিভিন্ন যন্ত্র এবং যথেষ্ট পরিমাণ ঘাস ও জল-এই সব দ্রব্য যুক্ত হবে।

মহাকবি কালিদাস তার 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যে বলেছেন –'সূর্য যেমন নিদাঘে পৃথিবী থেকে রস গ্রহণ করে, বর্ষাকালে সহস্রগুণ বর্ষণের দ্বারা ধরণীর অশেষ মঙ্গল সাধন করে, রাজা রঘুও তেমনি প্রজাদের কাছ থেকে কর গ্রহণ করে। সংগৃহীত সে করের সাহায্যে প্রজাদের কল্যাণ সাধন করতেন'। প্রজাদের সুখ সমৃদ্ধি ও সর্বাধিক নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে রাজ-কোষাগারের তাই ধন সঞ্চয়ের বিশেষ প্রয়োজন আছে। মনুর মতে এই কর গ্রহণ একটি নির্দিষ্ট নীতির দ্বারা পরিচালিত হত। তা হল- রাজা ও প্রজা উভয়পক্ষের যাতে মূলোচ্ছেদ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে রাজা কর গ্রহণ করবেন। আবার লোভের আতিশয্যবশতঃ রাজা প্রজাদের যেমন মূল উচ্ছেদ(সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত) করবেন না, তেমনি প্রজাদের প্রতি অতিস্নেহবশতঃ হেতু কর গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকে রাজা নিজেরও মূল উৎপাটন(রাজকোষ শূন্য) করবেন না। মনুসংহিতায় আরো বলা হয়েছে - প্রজাদের মূলধনের যাতে কোন ক্ষতি না হয়, সেভাবে জলৌকা অর্থাৎ জোঁকের রক্তপানের মত, গোবৎসের দুগ্ধপানের মত এবং ভ্রমরের মধুপানের মত, প্রজাদের কাছ থেকে রাজা অল্প অল্প করে কর গ্রহণ করবেন। পশু ও সুবর্ণের ক্ষেত্রে লভ্যাংশের পঞ্চাশভাগের একভাগ রাজা কর হিসাবে গ্রহণ করবেন। ধান্যের ক্ষেত্রে উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ বুঝে ষষ্ঠ বা অষ্টম বা দ্বাদশ ভাগ কর রূপে ধার্য করবেন। মহাভারতের শান্তি পর্বেও উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ কর হিসাবে গ্রহণের উল্লেখ আছে। কৌটিল্যও কোষবৃদ্ধির উপায় হিসাবে করগ্রহণ বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন - 'অদেবমাতৃক জনপদের অধিবাসীদের কাছ থেকে রাজা উৎপন্ন ধানের এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ কররূপে প্রার্থনা করবেন'। বৃক্ষ, মধু, ঘৃত, গন্ধদ্রব্য, ঔষধি, পুষ্প, ফল-মূলের ক্রয়বিক্রয়ের লভ্যাংশের ছয়ভাগের এক ভাগ কর হিসাবে গ্রহণ করবেন। লতা, শাক, ঘাস, বাঁশের তৈরী পাত্র, চামড়ার পাত্র, মাটির পাত্র, পাথরের পাত্র এই সব দ্রব্যাদিতে রাজা ছয়ভাগের এক ভাগ কর রূপে গ্রহণ করবেন। বণিকগণের নিকটও বাণিজ্য শুল্ক আদায় করা হত। এক্ষেত্রে রাজা বাণিজ্যদ্রব্যের ক্রয়মূল্য, বিক্রয়মূল্য,পথের খরচ, খাদ্যের এবং আনুষঙ্গিক খরচ, লাভযোগ এবং দ্রব্য রক্ষার ব্যয় এই সকল বিষয় বিবেচনা করে ন্যায়ানুসারে কর নির্ধারণ করবেন। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কর আদায় করা থেকে বিরত থাকবার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- রাজা নিতান্ত অভাবগ্রস্ত হলেও শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ থেকে কোন কর গ্রহণ করবেন না, বরং রাজা শ্রোত্রিয়দের বিদ্যা ও কর্ম অবগত হয়ে তাদের উপযুক্ত জীবিকার সংস্থান করবেন।

রাজ্যের সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত তারও স্পষ্ট বর্ণনার উল্লেখ পাওয়া যায় মনুসংহিতায়। মূলতঃ গ্রামস্তরে ও নগরস্তরে উভয়দিক দিয়েই শাসনব্যবস্থার প্রণালী বর্ণনা ররেছেন মনু। আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রাজা দুটি, তিনটি, পাঁচটি বা

একশতটি গ্রামের মধ্যে বিশ্বস্ত রক্ষকগণ সমন্বিত একজন আধিকারিক দ্বারা রাজ্যের রক্ষাস্থানরূপ গুল্ম স্থাপন করবেন। প্রথমে প্রত্যেকটি গ্রামের একজন অধিপতি(গ্রামিক) নিয়োগ করবেন। তারপর দশটি গ্রাম দেখাশোনার জন্য দশগ্রামাধিপতি, কুড়িটি গ্রাম নিয়ে বিংশতীশ, শতটি গ্রাম নিয়ে শতেশ এবং এইভাবে সহস্রপতি নিযুক্ত করবেন। গ্রামে চৌর্যাদি অপরাধ সংঘটিত হলে গ্রামিক স্বয়ং দশগ্রামপতিকে ধীরে ধীরে তা জানাবেন। দশগ্রামপতি বা বিংশতীশকে এইভাবে ক্রমে ক্রমে সংবাদটি গ্রামসহস্রপতির নিকট পৌঁছাবে। গ্রামপতি যে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে অক্ষম হবেন তার ঊর্ধ্বতন দশেশ বিংশতীশ ইত্যাদি ক্রমে তার দায়িত্ব ন্যস্ত হবে। এইভাবে রাজা নীচুস্তরের শাসনব্যবস্থা প্রচলন করেন এই গ্রামিক প্রভূতির মাধ্যমে।

রাজার পুরুষার্থসাধক কর্তব্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল অলব্ধলাভ এবং লব্ধবস্তুর পরিরক্ষন। যা লাভ হয়নি তা লাভ করার জন্য অনলসভাবে উদ্যোগী হবেন রাজা। বিজিগীষু রাজার প্রধান লক্ষ্য শত্রু রাজ্য জয় করা। তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করে শত্রুরাজ্য জয় করতে অগ্রসর হবেন। এই প্রকার বিজয়মান রাজার বিজয়ের পথে যারা প্রতিবন্ধকতা করবে তাদের সঙ্গে রাজা কিরূপ আচরণ করবেন, সেই বিষয়ে মনুসংহিতায় উপায় চতুষ্টয়ের বর্ণনা করা হয়েছে। যথা- সাম, দান, ভেদ ও দন্ড। সাম হল সান্ত্ববচন, মিষ্টি বাক্যের দ্বারা শত্রুকে তুষ্ট করা। সামের দ্বারা সন্তুষ্ট না হলে প্রচুর ধন- সম্পদ দান করে মিত্রতার পথে আনয়ন করতে হবে। দানের দ্বারা কার্যসিদ্ধি না হলে শত্রুদের মধ্যে ভেদ সাধন করতে হবে। সাম, দান, ভেদ এই তিনটি নীতি বিফল হলে দন্ডের (দেশ আক্রমণ) প্রয়োগ তথা যুদ্ধ করা অবশ্যম্ভাবী। মনুর মতে সাম ও দন্ড এই দুই নীতি রাষ্ট্র বৃদ্ধির সহায়ক, তাই পন্ডিতগণও এর প্রশংসা করেন।

প্রাচীন ভারতীয় স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে রাজাদের যুদ্ধনীতির বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনার উল্লেখ পাওয়া যায়। মনুসংহিতায়ও তাই বলা হয়েছে- রাজার প্রধান কাজ ছিল প্রজাপালন করা। 'ক্ষত্রিয়স্য পরো ধর্মঃ প্রজানামেব পালনম্' এবং সেজন্যে রাজাদের প্রায়শই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হতে হত। কোন রাজার পক্ষেই দীর্ঘকাল নিরুপদ্রবে রাজ্যশাসন করে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। তাই ক্ষত্রিয় রাজার পক্ষে যুদ্ধ করা একটি পবিত্র কর্ম এবং তা যজ্ঞের তুল্য। আততায়ী হয়ে যদি কেউ আক্রমণ করতে আসে, তখন রাজা কোনরকম বিবেচনা না করেই তাকে বধ করবেন। আততায়ী হল সেই ব্যাক্তি, যে কারোর শরীর, ধন, স্ত্রী বা পুত্রকে বিনাশ করতে উদ্যত হয়। মনু আরও বলেছেন- যুদ্ধক্ষেত্রে অপরাঙ্মুখ হয়ে সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে যে বীর নৃপগণ মৃত্যুবরণ করেন তারা স্বর্গে গমন করেন। ক্ষত্রিয় রাজা যে যুদ্ধ করবেন, মনুর মতে তা হবে ধর্মযুদ্ধ। প্রজাপালক রাজা সমবল, অধিকবল বা হীনবল বিপক্ষ

নরপতির দ্বারা যুদ্ধের জন্য আহূত হলে 'যুদ্ধেই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম' এই কথা স্মরণ করে রাজা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন, এই অবস্থায় কখনই তিনি যুদ্ধ করা থেকে বিরত হবেন না। যুদ্ধে যথেচ্ছাচারিতার স্থান ছিল না। যোদ্ধা কে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হত। এই নিয়ম অনুসারণ করে যুদ্ধকরাই হল যোদ্ধার ধর্ম। মনু যুদ্ধে কয়েকটি নিষিদ্ধ অস্ত্রের কথা বলেছেন - যে কূট অস্ত্র যার বহির্ভাগে কাষ্ঠপ্রভূতি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে কিন্তু ভিতরে গুপ্তরূপে ধারালো অস্ত্র রক্ষিত থাকে। কর্ণী অস্ত্র যাতে কর্ণারার ফলক থাকে এবং যা শরীরে বিদ্ধ হলে সহজে উৎপাটিত হয়না। দিগ্ধ অস্ত্র যাতে বিষলিপ্ত করা থাকে এবং তার স্পর্শ মাত্রে বিপক্ষ যোদ্ধার মৃত্যু হয়। অগ্নিজলিততেজন অস্ত্র যাতে অগ্নিদীপ্ত ফলক থাকে এই প্রকার অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করা নিষিদ্ধ ছিল। বর্তমানে কিন্তু এই নীতি প্রায়ঃশই লঙ্ঘিত হয়। যেন তেন প্রকারেণ শত্রুজয়ই বিজিগীষুর লক্ষ্য এ যুগে।

উপসংহার

মনুসংহিতায় প্রতিফলিত হয়েছে প্রাচীন ভারতবাসীর বিশ্বাস ও অভ্যাস। ধর্ম ও অর্থনীতির পাশাপাশি রাজনীতি তথা রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রণালী বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থে।বর্তমানে দেশে রাজা নেই, আছে রাজ্য এবং রাজ্যশাসন ব্যবস্থা, আছেন মন্ত্রিগণ এবং সচিবগণ। নেই রাজসভা, কিন্তু আছে লোকসভা ও বিধানসভা প্রভৃতি। কর ব্যবস্থা, যুদ্ধনীতি, ব্যসনাসক্তি, মন্ত্রগুপ্তি, দূতপ্রেরণ, চর নিয়োগ সবই রয়েছে নতূন রূপে ও নতূন সাজে। এই বিষয়গুলি নিয়ে সে যুগের চিন্তাভাবনা কেমন ছিল তা জানায় বলে এই গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম। শুধু ভারতবর্ষে নয়, মনুপ্রোক্ত রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার এই কাঠামো বিশ্বে বহু দেশে অনুসৃত হয়েছে। শাসকের আসনে যিনিই বসুন না কেন মনুর প্রোক্ত গুণাবলী তার থাকতেই হবে এবং মনুপ্রোক্ত আচরণবিধি তাকে মানতেই হবে। আজও ভারতের ন্যায়ালয়গুলিতে মনুর বিধান বহুলাংশে অনুসৃত হয়ে চলেছে। রাজ্যশাসক হবেন পবিত্র, সত্যসন্ধ, শাস্ত্রানুসারী এবং তার সহায়ক অমাত্যাদি হবেন বিশ্বস্ত, অর্থাদিশৌচযুক্ত, সজ্জন ও তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন। যে দেশের শাসকবর্গের মধ্যে এর ব্যাতিক্রম দেখা যায় সে দেশ কখনও উন্নত হতে পারে না। নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন, ব্যসন বর্জন, বিনয়শিক্ষা এগুলি যেমন রাজার কর্তব্য বলে গণ্য তেমনি যে কোন শাসকেরই এই গুণাবলী থাকা উচিত বলে মনে করা হয়।

তথ্যসূচী

১.*মনুসংহিতা*-৮/২৮৪, ৮/২৮০, ৮/২৬৮, ৮/২৮-২৯, ৭/৫৪, ৭/১৫৩-১৫৪, ৭/৬৯-৭৬,৭/১০৭, ৭/১২৮-১৪০,৭/২০০-২০০৭.
২. *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র* -১/১১/১, ১৬/১২/১, ৫/২.

গ্রন্থপঞ্জী

১.আচার্য মনু. *মনুসংহিতা.* সম্পা. ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মানবেন্দু. কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার.২০১৬(পুনর্মুদ্রণ).

২. আচার্য মনু. *মনুসংহিতা.* সম্পা. ডঃ বসু অনিলচন্দ্র. কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো.২০১৮(পুনর্মুদ্রণ).
৩. আচার্য মনু. *মনুসংহিতা.* সম্পা. ডঃ বসু ন্যায়তীর্থঃ সুমিতা. কলকাতা : বি.এন পাবলিকেশন.২০১৮.